# গহ্বর

সমীর সেন

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

কাল রজতের বিয়ে। রাত দশটা নাগাদ ও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল, আলমারি খুলে বের করল একটা লম্বা খাম। মোমবাতি জ্বালাল। তারপর টিউব আর ফ্যানের সুইচ অফ্ করে এসে বসল মোমের আলোর সামনে। খামের ভেতর থেকে বের করল একগোছা কাগজ, অর্থাৎ দু'বছর ধরে ওকে লেখা কেতকীর মোট পাঁচটি চিঠি। পাঁচ বছর আগেই যে দু'বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। চিঠিগুলি তারিখ অনুযায়ী পরপর সাজানো ছিল। প্রত্যেকটি চিঠিরই কতকগুলি অংশ আন্ডারলাইন করা লাল কালিতে।

প্রথম চিঠিটি হাতে নিল রজত, পুরোটাই পড়ল। চিঠি বলছে সেদিন চকোরী যখন ওদের বাড়িতে প্রথম আলাপ করিয়ে দিল আপনার সঙ্গে, বেশ ভালো লেগেছিল। আপনি বেশ গভীর ভাবে সব-কিছু ভাবতে পারেন, আবার তা বলতেও পারেন বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে। সেদিন আমাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে দেখছিলেন মনে হয়েছিল। কয়েকবার স্থিরচোখে তাকিয়েও ছিলেন আমার চোখে। গা কেমন শিরশির করছিল আমার। পরে চকোরীর কাছে শুনেছিলাম, আমার চোখ দুটিকে নাকি আপনার মনে হয়েছিল সমুদ্র। অবশ্য আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখে কোনো সমুদ্র খুঁজে পাই নি। যাই হোক, চকোরী আপনার নিজের বোন নয়, মাসতুতো বোন। অর্থাৎ ডাকপিওন হবার যোগ্য। ওর হাতে পাঠানো আপনার চিঠিটি দীর্ঘ। আমার সম্বন্ধে আপনার অনুভূতির কথা বেশ সুন্দর ভাবেই গুছিয়ে লিখেছেন। আপনি যে- সব প্রশস্তি করেছেন আমার, ভয় হচ্ছে আমি বোধহয় তার যোগ্য নই। আপনি অপাত্রে কিছু দান করতে যাচ্ছেন না তো? কিন্তু আপনার আহ্বান আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। পরশু দুপুর দুটোয় মেট্রোর সামনে থাকবো। চকোরী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই নির্ভরযোগ্য ডাকপিওন। চিঠিটি ওর হাত দিয়ে পাঠালাম।

চিঠি শেষ করে রজত সেটিকে ধরল মোমবাতির ওপর। জ্বলে উঠতেই ফেলে দিল মেঝেতে। চিঠি ছাই হয়ে গেল।

ও এবার দ্বিতীয় চিঠিটি তুলে নিল। আন্ডারলাইন বলছে সেদিন যখন হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল, বললাম, আর কত হাঁটবো গো, এ হাঁটার কি শেষ নেই। তুমি বলেছিলে, হাঁটাই জীবন, পৌঁছানো জীবনের পরিসমাপ্তি। এ-সব কথার অর্থ আমি বুঝি না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। তুমিও কি এ-সব বলো, বলতে ভালো লাগে বলেই, কী জানি!... দ্বিতীয় চিঠিটিও পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তৃতীয় চিঠির আন্ডারলাইন বলছে সেদিন নদীর পাড়ে বলেছিলে, আমি নাকি এক নদী, মহাকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে চলে যাচ্ছি মহাকালের দিকে। যাবার পথে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আচ্ছা, আমাকে নিয়ে তুমি ঠিক কী করতে চাও, বলো তো। আমি নদী নই। আমার নাম কেতকী মজুমদার, থাকি স্কট লেনে, বর্তমানে একটি চাকরি চাই। তারপর, সব মেয়েই যা চায়, একটি সংসারও চাই।... তৃতীয় চিঠিও পুড়ে ছাই হলো।

চতুর্থ চিঠিটি একটু ভালো করে পড়ল রজত। এ চিঠির গায়ে লেগে আছে কেতকীর কিছু রক্তমাংস। ঐ ঘটনার পর এ রকম একটি চিঠি যে আসবে অনুমান করেছিল রজত। চিঠিটি পাবার কয়েকদিন আগে হঠাৎই ও গিয়েছিল কেতকীদের বাড়ি এক সন্ধ্যায়। বাড়িতে কেউ ছিল না। কেতকী ছাড়া। আর-একজন যিনি ছিলেন, তিনি না থাকার সামিল। কেতকীর বৃদ্ধ, প্রায় অথর্ব দাদু নিজের ঘরে শুয়ে ঝিমোচ্ছিলেন।

রজতকে দেখে কেতকী খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। এনে বসালো নিজের ঘরে। তারপর চা করার জন্য চলে গেল। চিরক

ালের অন্যমনস্ক রজত যেন এই প্রথম লক্ষ্য করল কেতকীর পেছনটা বেশ ভারী। ওর বুকে রক্ত একটু ছলাৎ করে উঠল।
কিছুক্ষণ পরে কেতকী ফিরল চা, ওমলেট, মিষ্টি নিয়ে। সোফার সামনের ছোটো টেবিলটিতে রাখল। বলল, খাও। নিজে বসল রজতের থেকে একটু ব্যবধান রেখে সোফার এক কোণায়।
বেশ কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। রজত একমনে খেয়েই চলেছে। যেন দুজনের কেউ বুঝতে পারল না যে এরকম ফাঁকা বাড়িতে কী বলতে হয়, কী করতে হয়। দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের শব্দে কি কোনো প্ররোচনা ছিল? খাওয়া শেষ করে একটু অস্বস্তি নিয়ে রজত তাকাল কেতকীর দিকে। ওর বুকের ওপর থেকে আঁচল খসে পড়েছে। যেন সে খেয়ালই নেই। কেমন উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। লো কাট্ ব্লাউজের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে দুটি স্ফীত পুষ্ট স্তন। প্রবল অস্বস্তি নিয়ে ঘামতে ঘামতে রজত দেখল সোফার প্রান্তে যে বসে আছে সে সমুদ্র নয়, নদী নয়, অফুরান পথও নয়। রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বসে আছে স্কট লেনের কেতকী মজুমদার। উদাস, শূন্য দৃষ্টি দেয়ালের দিকে। পেন্ডুলাম যেন বলে উঠল, রজত, তুমি আদিম পুষ. ওঠো, সাড়া দাও আদিম নারীর আহ্বানে। রজত আর পারল না, টলতে টলতে এগিয়ে গেল কেতকীর দিকে। কেতকীর কণ্ঠ ক্ষীণভাবে বলতে লাগল না, না, না। ওর কামনামদির চোখ নীরবে বলতে লাগল আমাকে নাও, রজত, আমাকে নাও। তারপর যা ঘটার ঘটে গেল।
রাত্রে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রজতের মনে হলো, ওর বুকে সমুদ্র নেই, নদী নেই, পথ নেই, বুক জুড়ে পাষাণের মতো ভারী হয়ে শুয়ে আছে স্কট লেনের কেতকী মজুমদার নাম্নী একটি অতি সাধারণ মেয়ের নগ্ন শরীর।
চিঠিটি এলো তার কয়েকদিন পরে। আন্ডারলাইন বলছে  সে দিন সন্ধ্যায় ধূপের মতো পোড়ালাম। নিজেকে আমার দেবতার পূজার জন্য। সেই সুগন্ধে আমার মন ভরে উঠেছে। প্রেমও এমন পূজা হয়ে উঠতে পারে আগে জানতাম না। এর পরের কথা তুমি কিছু ভেবেছ? এর পরের কথা তো 'সংসার' নামক শব্দটি, রজত। শব্দটি হয়তো তোমার খুব পছন্দসই নয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, আমরা দুজন তো দাঁড়িয়ে আছি এই শব্দটির সামনে।.... রজত এই চিঠিটাও পোড়াল।
শেষ চিঠিটি বেশ কয়েকবার পড়ল রজত। চিঠিতে রজতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে কেতকী। অভিযোগকারিণী, তার পক্ষের উকিল এবং বিচারক সবই স্বয়ং কেতকী। চিঠিটি একটু দীর্ঘ। আন্ডারলাইন বলছে  চকোরী মারফত তোমার চিঠি পেলাম। তোমার শেষ চিঠি। ভেবে-ভেবে অনেক বিদগ্ধ যুক্তি তুমি খাড়া করেছ আমাকে নিয়ে সংসার পাতার ব্যাপারে তোমার অক্ষমতার সপক্ষে। তোমার আর্থিক বা অন্য কোনো বাস্তব অক্ষমতার কথা আমার জানা নেই। তোমার অক্ষমতা বোধ হয় বাস্তবকে বাস্তব বলে মেনে নেওয়ার অক্ষমতা। তোমার অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতাই তোমার প্রধান শত্রু। আমি যা নই, কল্পনা দিয়ে তা-ই তুমি রচনা করে নিয়েছিলে তোমার বিলাসিতার জন্য।
সেদিন সন্ধ্যায় তোমার কল্পনার মূর্তি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল যখন, তুমি সভয়ে দেখলে ভাঙা টুকরোগুলিকে দিয়ে আর সংসার পাতা যায় না। ঠিক কিনা, রজত? তোমার অক্ষমতা ঐ জায়গায়। যাক, দোষ তোমার নয়, আমার ভাগ্যের। তবে সেই সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত তোমার ভালোবাসা অন্তত তোমার মতো করে সত্য ছিল, যা আমার সত্তার গভীরে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। সে তো আজ আমার নিজস্ব সম্পত্তি, রজত। তা-ও কি ফেরত চাও? চাইলেই বা দেব কেন? তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমার কাছে তো থেকে গেল তোমার ভালোবাসা, আমার ভালোবাসা, আমাদের প্রেম। যখন যেখানেই থাকো, যাকেই বিয়ে করো, সুখে থেকো।....
এই চিঠিটি পোড়াতে গিয়ে একটু হাত কাঁপল রজতের। দুবার চিঠিটি আগুনের কাছে নিয়ে যেতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল সে। ওর মনে হলো , আগুন যেন চিঠিটি নিতে অস্বীকার করছে। মোমের শিখা কি কেঁপে-কেঁপে প্রতিবাদ করছে এই নিষ্ঠুর দহনের? চিঠিটিই কি অস্বীকার করছে আগুনের কাছে যেতে? না কি রজতের হাত চেপে ধরছে আর-এক রজত? চিঠিটি রজত প্রায় জোর করে আবার নিয়ে গেল আগুনের কাছে। আর ইঞ্চি দু-এক দূরেই আগুন। হঠাৎ রজত সভয়ে লক্ষ্য করল ঐ ফাঁকা জায়গাটিতে শুয়ে আছে কেতকীর শিথিল নগ্ন শরীর। কেতকী যেন বলে উঠল, এই শরীর কি অপবিত্র, রজত? এই শরীরের নীচে একটা মন ছিলো, মনে ভালোবাসা, শরীর তো পবিত্র, রজত। দ্যাখো, এই শরীর কী সুন্দর!
রজত প্রায় মিনতির সুরে বলে উঠল। কেতকী, পরশু সন্ধ্যায় এক নবাগতা এই বাড়িতে আসবে। চিঠিটি যদি তার হাতে পড়ে, তুমি কী সুখী হবে?

রজত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল কেতকীর শরীর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।
চিঠিটি আগুন স্পর্শ করল। হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গেল রজত। চিঠিটি ধরেই থাকল অন্যমনস্কভাবে। আগুন এসে স্পর্শ করল ওর আঙুল। সচকিত হয়ে রজত ফেলে দিল প্রায়-দগ্ধ চিঠিটি। আঙুল জ্বালা করতে লাগল ওর। বারনলে কি এ জ্বালা জুড়াবে?
আজ রজতের ফুলশয্যার রাত। বারোটা নাগাদ বাড়ির সবার সঙ্গে শেষ ব্যাচে খেয়ে দোতলায় ওদের ঘরটিতে উঠে এসেছে রজত আর মালা। বাসরঘরে সারারাত হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব আর গান বাজনার মধ্য দিয়ে কেটেছে দুজনের। আজই প্রথম প্রায় অপরিচিতা মালার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাবে রজত।
মালা বাথমে ঢোকার পর রজত শুয়ে পড়েছিল। ফুলশয্যার খাট বেশ ভালোভাবেই সাজানো হয়েছে। যারা সাজিয়েছিল, তারা দুজনের বালিশ পেতেছিল একেবারে ঘেঁসাঘেঁসি করে। রজত ভাবল, হয়তো তাদের কেউ-কেউ তাদের বিগত বা অনাগত ফুলশয্যার রাতের কথা ভেবে মনে-মনে মালার জায়গাটাতে শুয়েও পড়েছিল।
বাথম থেকে বেরিয়ে মালা সুইচবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আলোটা নেভাব? রজত বলল, নেভাও। আলো সে নিভিয়ে মালা এসে ঢুকল বিছানায়। নিজের বালিশটিকে বেশ-একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মালা যেন আর সব মেয়ের মতোই বলতে চায়, আমি কি অতই সহজলভ্য, যে হাত বাড়ালেই ধরা দেব। রজত জানে ব্যবধানটুকু ওরই পার হতে হবে। জীবনে মাত্র একবারই ওকে পার হতে হয়েছিল এই ধরনেরই এক ব্যবধান, একটি সন্ধ্যায়, এক বিশেষ পরিস্থিতিতে। সীমান্ত অতিক্রম করেছিল অবৈধভাবে। তাই মনে ভয় ছিল, অস্বস্তি ছিল। আজ অবস্থা অন্যরকম, আজ রজতের বৈধ পাসপোর্ট আছে। সামান্য একটু টালবাহানার পর ভিসা অফিস ভিসাও মঞ্জুর করে দেবে। একটু উদ্‌যোগ নিলেই হবে রজতের। রজত জিজ্ঞেস করল, তোমার ঘুম পেয়েছে? মালা ছোট্ট উত্তর দিল, হ্যাঁ। রজত রসিকতা করে বলল, আমারও, ঘুমাই? মালা বলল, ঘুমাও।
নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা দিয়ে রজত মরিয়া হয়ে বেরিয়ে আসার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজতে লাগল। খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে গেল। বাঁচিয়ে দিল মালাই, বলল, আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় তুমি তোমার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে না, একজন জাদুকর মুরারি চক্রবর্তী, অন্যজন কবি অনিদ্ধ বক্‌শী? রজত উৎসাহ নিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুজনেই আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
মালা বলল, এঁদের দুজনের নামই আমার পরিচিত। রজত বিস্মিত হলো, বলল, কী করে, এরা তো কেউ বিখ্যাত নয়? মালা বলল, দুটি চিঠিতে নাম দুটির উল্লেখ পেয়েছি। রজত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, কার চিঠি, কাকে লেখা? মালা বলল, আমার এক বান্ধবী কেতকীকে লেখা ওর প্রেমিক দিগন্তর চিঠি। দিগন্ত অবশ্য আসল নাম নয়, কেতকীর ভদ্রলোককে মনে হতো একটু সুদূর, তাই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে ঐ নামে ডাকত। ভদ্রলোকও চিঠির নীচে লিখতেন, ইতি তোমারই দিগন্ত।
রজতের বুকে কে যেন একটা ছুরি বসিয়ে দিল। কেতকীকে লেখা ওর চিঠি তো মালা পড়েছে, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু ওদের সম্পর্কের শু থেকে শেষ পর্যন্ত কতটুকু জানে মালা? কেতকী কতটুকু বলেছে? দিগন্ত নামের আড়ালে আসল নামটি কি জানে মালা, কেতকীর সেই প্রেমিকই যে এখন স্বামী হয়ে ওর পাশে শুয়ে আছে, জানে? সব জেনেও কি ও বিড়ালের ইঁদুর ধরার খেলা খেলছে? একটু সাবধানে এগোনোই ভালো মনে করল রজত। বলল, তোমার বান্ধবী বুঝি ওর প্রেমিকের লেখা সব চিঠিই তোমাকে পড়িয়েছে?
মালা বলল, শুধু পড়াবে কেন, চিঠিগুলি তো সব আমার কাছেই আছে। রজতের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে এলো, হেসে উঠল, কেন? বিয়ের পর ও-সব চিঠি কি কেউ শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নাকি, সবাইকে দেখানোর জন্য? তবে দেখাবার মতো চিঠি বটে। ভদ্রলোক কিন্তু খুব সুন্দর চিঠি লিখতে পারতেন।
এই অনিশ্চিত বিপদসংকুল অবস্থাতেও চিঠির প্রশংসায় মনে-মনে খুশি হলো রজত, বলল, চিঠিগুলি পড়তে তোমার ভালো লেগেছে? মালা বলল, ভালো লাগার মতোই তো চিঠি। আমি যে কতবার পড়েছি। আর অনেক মজাও আছে চিঠিগুলির মধ্যে।
রজত বিস্মিত হলো, মজা? মালা বলল, হ্যাঁ, মজাই তো। ভদ্রলোকের চোখে কেতকী কত কী যে হয়ে উঠেছে। সমুদ্র, নদী,

দিগন্তে চলে-যাওয়া অফুরান পথ। এগুলি তো সব মাটির ওপরকার ব্যাপার। কেতকী অনেক সময় মাটির অনেক ওপরেও উঠে গিয়েছে। যেমনও হয়ে উঠেছে মেঘের আড়ালে চলে-যাওয়া রহস্যময়ী চাঁদ, স্থির ধ্রুবতারা, মৌন মহাকাশ। কী যে হয়ে ওঠে নি আমাদের কেতকী! একটুথেমে বলল, আচ্ছা, তোমার তো টুরের চাকরি। টুরে গিয়ে ওরকম সুন্দর-সুন্দর চিঠি আমাকে লিখতে পারবে? তোমার চোখ দুটি তোবেশ ভাবুকের মতো।

রজতের মনে হলো মালা ক্রমশই ঠেলতে-ঠেলতে ওকে একটা খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ঠেলে ফেলে দিতে পারে অতল গহ্বরে। মালার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘামতে ঘামতে রজত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ওদের বিয়ে হলো না কেন? মালা উত্তর দিল, শেষ চিঠিতে তো বিয়ে না করার সপক্ষে অনেক সুন্দর সুন্দর যুক্তি খাড়া করেছেন ভদ্রলোক। আসলে ও-সব বাজে কথা। কিছুদিন ফুর্তি করে কেটে পড়েছে আর কী। ভদ্রলোকের স্ত্রীর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

মালার নিক্ষিপ্ত বর্শা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল রজতের হৃৎপিণ্ড। ও আর্তনাদ করে উঠল, না, মালা, না, সেদিনের সন্ধ্যার সেই ঘটনাটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনামাত্র। আমি কেতকীকে নিয়ে ফুর্তি করতে চাইনি, কখনো করিও নি। আমি ভালোবেসেছিলাম কেতকীকে। কেতকীর শরীর শত্রুতা করেছে কেতকীর সঙ্গে, আর আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে আমার অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ মন। কেতকী আমাকে বুঝেছিল, মালা। আমাকে লেখা শেষ চিঠিতে তার প্রমাণ আছে।

মালা কখন উঠে বসেছে উত্তেজনার মধ্যে তা খেয়াল করে নি রজত। মালা ধীরে ধীরে বলল, ও, তাহলে তুমিই কেতকীর সেই প্রেমিক। কেতকীর চিঠিগুলি কী করেছ?

রজত অপরাধীর মতো বলল, বিয়ের আগের রাতে পুড়িয়ে ফেলেছি, মালা। মালা বলল, ও কিন্তু তোমার চিঠিগুলি প্রাণে ধরে পোড়াতে পারে নি। বিয়ের আগে আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। এখানেই পুষ আর নারীর তফাত।

আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মালা। আসলে কেতকী কখনো এ ব্যাপারে পুরোপুরি সব খুলে বলে নি মালাকে। একটু ভাসা-ভাসা ভাবে যা বলার বলেছে। সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার কথা তো বলেই নি। সব খুলে বলাতে একটা আত্ম অবমাননা আর অস্বস্তি আছে। একজন নারী তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকেও সব খুলে বলতে পারে না।

এতক্ষণে বুঝল মালা কেতকী কেন বিয়েতে আসে নি। এখন এ-ও মনে হলো, বিয়ের কার্ডটা পড়তে -পড়তে যেন কেতকীর মুখে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল মালা। তবে তেমন গুত্ব তখন দেয় নি মালা এ-ব্যাপারে। এখন বুঝল কার্ডে তো রজতের নাম, বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা ছিল। এ-ও মনে পড়ল মালার, ওর ভাবী বরকে ও দেখেছে কি না, দেখে থাকলে দেখতে কেমন, এ-সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল কেতকী। যেহেতু রজত দেখতে এসেছিল মালাকে, ও কেতকীকে রজতের চেহারার একটা বর্ণনাও দিয়েছিল। অবশ্য কেতকী কোনোদিনই 'দিগন্ত' নামের আড়ালে আসল নামটি বলে নি মালাকে, হয়তো বলার প্রয়োজন আছে মনে করে নি।

জানালা থেকে সরে গিয়ে ঘরের দরজা খুলে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল মালা। নামছে তো নামছেই। ভাবল, এই সিঁড়ি যেন কোনো অতল গহ্বরের দিকে নেমে গিয়েছে। হায় ঈশ্বর, এই সিঁড়ি যেন আর শেষ না হয়।

বিছানায় শুয়ে আছে একা রজত। নিশুত রাতের পৃথিবী শব্দহীন। শোনা যাচ্ছে শুধু দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের শব্দ। পেন্ডুলাম সময় ভেঙে-ভেঙে দুলছে। সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল রজতের। সেদিনও পেন্ডুলাম দুলছিল। কী প্ররোচনা দিয়েছিল তা-ও তো রজত জানে। আজকের পেন্ডুলাম কী প্ররোচনা দিচ্ছে? আত্মহননের? না, সে পথে যাবে না রজত। নিজেই পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকবে। এক কোটিতে পৌঁছে ধাক্কা খাবে কেতকীর, আরেক কোটিতে পৌঁছে মালার। রজত কোথাও পৌঁছাবে না। দুটি শাঁখা-পরা হাতের ধাক্কায় দুলতে থাকবে পেন্ডুলামের মতো। দুলতেই থাকবে চিরকাল।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com